কুরবানীর ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কতিপয় বিধান

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿الأضحية: تأريخها وبعض من أهدافها وأحكامها﴾

« باللغة البنغالية »

محمد عبد القادر

مراجعة: د. محمد منظور إلهي

2011 - 1432

IslamHouse.com

কুরবানীর ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কতিপয় বিধান

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি কিছু ইবাদত ফরজ করেছেন, আর কিছুকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। মুসলিমগণের উচিত একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেগুলো সম্পন্ন করা। কুরবানী সে ধরনের একটি ইবাদত যার বিধান আদম (আ.) এর যুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঠিক ইতিহাস ও বিধানাবলী সম্পর্কে আমরা খুব কমই অবগত আছি। আলোচ্য নিবন্ধটি এ বিষয়ে আমাদের অনেক সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ক) কুরবানীর ইতিহাস :

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী:

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেই আদি পিতা আদম (আ.) এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (আ.) এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ ﴾ [المائدة: ٢٧]

অর্থাৎ, আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের একজন বলল, ‘আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, ‘আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবূল করে থাকেন।[সূরা মায়িদা (৫):২৭]।

মূল ঘটনা হলো:

যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া (আ.) এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (জময) অর্থাৎ একসাথে একটি পুত্র ও একটি কন্যা এরূপ জময সন্তান জন্মগ্রহণ করত। কেবল শীস (আ.) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া আদম (আ.) এর আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ.) এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ

থেকে জন্মগ্রহনকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারীনি কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় আদম (আ.) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিতেন। ঘটনাক্রমে কাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল আকলিমা। কিন্তু হাবিলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে অতটা সুন্দরী ছিল না। সে ছিল কুশ্রী ও কদাকার। তার নাম ছিল লিওযা। বিবাহের সময় হলে শরয়ী ‘নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহোদরা কুশ্রী বোন কাবীলের ভাগে পড়ল। ফলে আদম (আ.) তৎকালীন শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষি তে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাকে তার নির্দেশ মানতে বললেন। কিন্তু সে মানল না। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করলেন। তবুও সে ঐ বকাঝকায় কান দিল না। অবশেষে আদম (আ.) তার এ দু‘সন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ কর, যার কুরবানী গৃহীত হবে, তার সাথেই আকলিমার বিয়ে দেয়া হবে।’ সে সময় কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে ভষ্মীভূত করে ফেলত। আর যার কুরবানী কবূল হতো না তারটা পড়ে থকত। যাহোক, তাদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো- কাবীল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভাল ভাল মালগুলো বের করে নিয়ে বাজে মালগুলোর একটি আটি

কুরবানীর জন্য পেশ করল। আর হাবীল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্যে থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য পেশ করল। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবীলের কুরবানীটি ভষ্মীভুত করে দিল। [ফতহুল ক্বাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবীলের পেশকৃত দুম্বাটি জান্নাতে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে। অবশেষে ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ (আ.) কে ঐ দুম্বাটি পাঠিয়ে বাঁচিয়ে দেয়া হয়।] আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকল। অর্থাৎ হাবীলেরটি গৃহীত হলো আর কাবীলেরটি হলো না। কিন্তু কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারল না। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলল, ‘আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল, এতে কাবীলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। হাবীল বলেছিল, ‘ তিনি মুত্তাক্বীর কর্মই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাক্বওয়ার কর্মই গ্রহণ করো। তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?.....তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবীল কে হত্যা করে ফেলল। (তাফসীর ইবনু কাসীর, দুররে মনসূর, ফতহুল বায়ান, ৩/৪৫ ও ফতহুল ক্বাদীর, ২/২৮-২৯)

কুরআনে বর্ণিত হাবীল ও কাবীল কর্তৃক সম্পাদিত কুরবানীর এ ঘটনা থেকেই মূলত কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরবানী দাতা ‘হাবীল’, যিনি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে একটি সুন্দর দুম্বা কুরবানী হিসেবে পেশ করেন। ফলে তার কুরবানী কবূল হয়। পক্ষান্তরে কাবীল, সে অমনোযোগী অবস্থায় কিছু খাদ্যশস্য কুরবানী হিসেবে পেশ করে। ফলে তার কুরবানী কবূল হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো কুরবানী মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া কবূল হয় না। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ٣٤ ﴾ [الحج: ٣٤]

অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা উক্ত পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। [সূরা হাজ্জ (২২):৩৪]।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেন, ‘আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা‘আলা তার নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন। (তাফসীরে নাসাফী ৩/৭৯; কাশশাফ, ২/৩৩)।

আদম (আ.) এর যুগে তারই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ইতিহার ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন দ্বীন-ধর্ম অথবা মানবজাতির ইতিহার। মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যত শরীয়ত নাযিল হয়েছে, প্রত্যেক শরীয়তের মধ্যে কুরবানী করার বিধান জারি ছিল। প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের এ ছিল একটা অপরিহার্য অংশ। তবে ঐসব কুরবানীর কোন বর্ণনা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মূলত সেসব কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমাদেরকে জানানো হয়নি।

বর্তমান কুরবানীর ইতিহাস :

পবিএ কুরআনে এসেছে-

﴿ رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠٠ فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٖ ١٠١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ١٠٣ وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ١٠٤ قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٠٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ١٠٦ وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧ وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ ١٠٨ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ ١٠٩ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١١٠ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١١ ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١١١]

[ইব্রাহীম (আ.) যখন আমার কাছে দু‘আ করল] হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এক সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাকে এক অতি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফিরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম বলল, ‘বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি, এখন বল, তোমার অভিমত কী? সে বলল, ‘হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। দু‘জনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল আর ইবরাহীম তাকে কাত ক‘রে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, ‘হে ইবরাহীম! স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেই ছাড়লে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এক মহান কুরবাণীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। আর আমি তাঁকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার মু‘মিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা আস- সাফফাত:১০০-১১১]।

ইবনে কাসীর (রাহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানান যে, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) যখন তার পিতৃভুমি থেকে হিজরত করলেন, তখন তিনি তার প্রভুর কাছে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ

দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইসমাঈলের (আ.) ব্যাপারে, কেননা তিনি ছিলেন ইব্রাহীমের (আ.) ঔরসে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দ্বীনের (ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম) অনুসারীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে ইব্রাহীমের ঘরে ইসমাঈলই প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/১৫৭-১৫৮)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡىَ অর্থাৎ ‘এবং যখন সে তার সাথে হাটার মত বড় হলো’- এর অর্থ হচ্ছে, যখন সে বড় হয়েছিল এবং তার বাবার মতই নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে পারত। মুজাহিদ (রাহ.) বলেন, ‘এবং যখন সে তার সাথে হাঁটার মত বড় হলো’ এর অর্থ হচ্ছে, যখন সে বড় হয়ে উঠেছিল এবং বাহনে চড়তে পারত, হাঁটতে পারত এবং তার বাবার মত কাজ করতে পারত। ফার্রা বলেন, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। ইবনু আববাস (রা.) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবলকত্বে উপনীত হয়েছিলেন। (তাফসীর কুরতুবী, ১৫/৯৯) এ রকম একটা অবস্থা যখন আসল, তখন ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে তার ছেলেকে কুরবানী করার আদেশ দেয়া হচ্ছে। নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহী। তাদের চক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে, তার প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করার আদেশ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, যে পুত্রকে তিনি তার বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছিলেন এবং তারপর শিশু অবস্থায় তাকে এবং তার মাকে মরুভুমিতে রেখে আসার আদেশ পেয়েছিলেন, এমন

একটা উপত্যকায় যেখানে কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ ছিল না, কোন মানুষজন ছিল না, কোন বৃক্ষরাজি ছিল না এবং কোন পাখ-পাখালী বা পশুও ছিল না। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালন করলেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের সেখানে রেখে আসলেন। আর আল্লাহ তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে রিযিক পাঠালেন। এত কিছুর পরেও, তার ঘরে প্রথম জন্ম নেয়া ও তার একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার জন্য যখন আদেশ করা হলো, তিনি তখন তাঁর প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তার প্রভুর আদেশ মেনে, তিনি যা চেয়েছিলেন, তা করতে উদ্যত হলেন। তাই তিনি তার পুত্রকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে বললেন- যেন সে শান্ত থাকে এবং জোর করে তাকে কুরবানী করতে না হয়।

‘হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি (আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করছি)। তাহলে, তুমি কি মনে কর!’ ধৈর্যশীল ছেলেটি সাথে সাথেই জবাব দিল, ‘সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। সে সবচেয়ে উত্তম জবাব দিল, এটাই ছিল তার পিতার প্রতি এবং মানব কুলের প্রভুর প্রতি বাধ্যতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহ বলেন, فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ‘তারপর তারা উভয়ে নিজেদেরকে (আল্লাহর ইচ্ছার কাছে) সমর্পণ করল, এবং সে

তাকে তার পার্শ্বে উপর কাত অবস্থায় শুইয়ে দিল’ এখানে বলা হয়েছে, ‘যখন তারা উভয়ে নিজেদেরকে সমর্পণ করল’- অর্থ হচ্ছে তারা দু‘জনে যখন নিজেদেরকে আল্লাহর আদেশের কাছে সমর্পণ করল। ‘এবং সে তাকে শুইয়ে দিল’- এর অর্থ হচ্ছে তিনি, তাকে ছেলেকে) মাটির দিকে মুখ করে রাখলেন। এখানে বলা হলো যে, তিনি তাকে পেছন থেকে যবেহ করতে চাইলেন, যেন তিনি যবেহ করার সময় তার মুখটা দেখতে না পান। এটা ছিল ইবনে আববাস (রা.), মুজাহিদ (রাহ.) এর মত। ‘তারা উভয়ে নিজেদের সমর্পণ করল’ এর অর্থ হচ্ছে ইব্রাহীম (আ.) বললেন, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ আর ছেলেটি বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ - কেননা সে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিল। আস সুদ্দী এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ইব্রাহীম (আ.) ছেলেটির গলদেশে ছুরি চালান, কিন্তু তা তাকে কাটেনি। এটা বলা হয়ে থাকে যে, ছুরি ও তার গলার মাঝখানে একটা তামার পাত রাখা হয়েছিল (এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।) তারপর তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল যখন আল্লাহ বললেন,

﴿ قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ ﴾ [الصافات: ١٠٥]

‘হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ!’- এর অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তোমার প্রভু তোমাকে যে আদেশ করেছেন, তা পালন করার ব্যাপারে তোমার ইচ্ছা ও আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে। তোমার পুত্রের পরিবর্তে বিকল্প কুরবানীর ব্যবস্থা করা হবে- যেমন ভাবে

তুমি তোমার নিজের শরীরকে আগুনের শিখায় সমর্পণ করেছিলে এবং তোমার অতিথিদের সম্মান জানাতে তোমার সম্পদ খরচ করেছিলে, তা স্মরণ রেখে। তাই আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ ﴾ [الصافات: ١٠٦]

‘নিশ্চয় এটা ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা’- অর্থাৎ এটা যে একটা পরীক্ষা ছিল তা পুরোপুরি স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এখানে মূল উদ্দেশ্য যবেহ ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা-পুত্রের আনুগত্য ও তাক্বওয়ার পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পিতার পূর্ণ প্রস্তুতি এবং পুত্রের স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি ও আনুগত্যের মাধ্যমে।

﴿ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾ [الصافات: ١٠٧]

‘আমরা তাকে একটা বড় কুরবানী দিয়ে মুক্ত করলাম’- এর অর্থ হচ্ছে আমরা তার ছেলের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করলাম, তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য বিকল্প হিসেবে । বেশিরভাগ আলিমের মতে, এটা ছিল শিং বিশিষ্ট খুব সুন্দর সাদা একাটা ভেড়া। ইবনে আববাস (রা.) থেকে আস-সাওরী আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খাইসাম, সাঈদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেন যে, ‘এটা ছিল এমন একটা ভেড়া যা চল্লিশ বছর ধরে জান্নাতে বেড়িয়েছে।’ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ রকম বর্ণনাও এসেছে যে, ঐ ভেড়ার শুকনো মাথাটা এখনই কা‘বা শরীফের দাদের [পানি নির্গমনের] পাইপ থেকে ঝুলে রয়েছে। কেবল এটা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাকে কুরবানী করার কথা ছিল, তিনি ছিলেন ইসমাঈল

(আ.)- কেননা তিনি মক্কায় বসবাস করতেন এবং আমরা এমন কখনো শুনিনি যে ইসহাক (আ.) তার ছেলেবেলায় কখনো মক্কায় এসেছিলেন, আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানে। (ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/১৫৭-১৫৮)।

যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি ইসহাক্ব (আ.) নন; বরং তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আ.), তার কারণগুলো উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন যা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, ইসমাঈল (আ.) এরই কুরবানী হওয়ার কথা ছিল। সেই বিষয়গুলো এ রকম:

- ইসমাঈল (আ.) ছিলেন তার প্রথম সন্তান, যার ব্যপারে ইব্রাহীম (আ.) - কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। মুসলিম ও আহলে কিতাবগণের ইজমা (ঐক্যমত্য) অনুসারে তিনি হলেন ইসহাক্ব (আ.)- এর চেয়ে বড়। আহলে কিতাবগণের কিতাবসমূহে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীমকে (আ.) তার একমাত্র পুত্র কুরবানী দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এবং কোন কোন নথিতে আছে যে, তাকে তার প্রথম জন্ম নেয়া ছেলেকে কুরবানী দিতে বলা হয়েছিল।
- সাধারণত প্রথম ছেলে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, আর তাই তাকে কুরবানী করা আদেশ পরীক্ষার জন্য অধিকতর উপযোগী।

- এটা উল্লিখিত রয়েছে যে, এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং তাকেই কুরবানী করার আদেশ পরীক্ষার জন্য অধিকতর উপযোগী।

- এটা উল্লিখিত রয়েছে যে, এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং তাকেই কুরবানী করার কথা ছিল। এর পরে একই সূরায় ফেরেশতারা ইব্রাহীমের (আ.) কাছে ইসহাক্বের সুসংবাদ নিয়ে আসলেন, তারা বললেন, ﴿قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ۝٥٣﴾ [الحجر: ٥٣] 'আমরা আপনাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি যার অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকবে।' [সূরা হিজর: ৫৩]।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ ۝٧١﴾ [هود: ٧١]

আমরা তাকে (সারাকে) ইসহাক্বের সুসংবাদ দিলাম এবং তার পরে ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম।' [সূরা হুদ (১১):৭১] এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ইয়া'কূব বলে একজন শিশুর জন্ম হবে তাদের (সারা এবং ইসহাক্বের) জীবদ্দশায় এবং তার থেকে অনেক বংশ বিস্তার লাভ করবে এবং এটা সঠিক শোনায় না যে, ইব্রাহীমকে সেই ইসহাক্বকেই কুরবানী করতে বলা হবে যখন তিনি ছোট ছিলেন তখন, কেননা আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে তার অনেক বংশধর থাকবে।

- ইবরাহীম (আ.) এর বয়স যখন ৮৬ বৎসর তখন ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং যখন ৯৯ তখন বিবি সারার গর্ভে ইসহাক্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীম (আ.) সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১৬, মুয়াত্তা, তাফসীরে কুরতুবী, ২/৯৮-৯৯)।
- এখানে সূরা সাফফাতে ইসমাঈলকে ধৈর্যশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই পটভুমিতে যথার্থ। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১৫) আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূল (সা.) এর নবূয়্যতের সমসাময়িক সময়ের ইয়াহুদীরা জানত যে, আরব ভুমিতে একজন নবী আসছেন এবং তারা তার জন্য রীতিমত অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু ইসহাক্ব (আ.) থেকে বিস্তৃত বণী ইসরায়েলের বংশধারায় জন্মগ্রহণ না করে, ইসমাঈল (আ.) এর বংশধারায় জন্মগ্রহণ করলেন- তখন তারা তা সহ্য করতে পারল না।

(খ) কুরবানীর অর্থ ও তার প্রচলন:

আরবী 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা ঊর্দূতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। আর 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবাতুন' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবী 'কুরবাতুন' এবং 'কুরবান' উভয় শব্দের শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কারো নৈকট্য লাভ করা প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায় 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা

আল্লাহ রাববুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন ও তার ইবাদতের জন্য পশু যবেহ করা হয়। (মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, আল-ক্কামূসুল মুহীত্ব, পৃ. ১৫৮; মুফরাদাত লি ইমাম রাগিব ৩/২৮৭; তাফসীরে কাশশাফ, ১/৩৩৩; রায়যাবী, ১/২২২।

আরবীতে 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তাই কুরআনে 'কুরবানী'র বদলে 'কুরবান' শব্দটি মোট তিন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে যেমন১. নং সূরা আল 'ইমরানের ১৮৩ নং আয়াত, ২. নং সূরা মায়িদা'র ২৭ নং আয়াত এবং ৩. নং সূরা আহক্কাফের ২৮ নং আয়াত। অনুরূপভাবে হাদীসেও 'কুরবানী' শন্দটি ব্যবহৃত না হয়ে তার পনিবর্তে 'উযহিয়্যাহ' এবং 'যাহিয়্যাহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'উযহিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেড়াকে বলা হয়। এ শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ 'পূর্বাহ্ন'। যেহেতু কুরবানী যরেহ করার উত্তম সময় হলো ১০যিলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল, তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে 'উযহিয়্যাহ' বলা হয়েছে। এটিকে আবার 'যাহিয়্যাহ' বা 'আযহা'ও বলা হয়। আর 'আযহাহ' এর বহুবচন হলো 'আযহা', যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আযহা'। বলা বাহুল্য, ঈদুযযোহা কথাটি ঠিক নয়।

মূলত ফারসী, হিন্দী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় আরবি 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবানী' অর্থে ব্যহৃত হয়। বাংলার মুসলিমরাও 'কুরবানী' শব্দটির সাথে বেশ পরিচিত।

বর্তমানে আমাদের নিকটে কুরবানীর পশুকেই বিশেষভাবে 'কুরবান' বলা হয়।

(তাফসীরে আল-মানার, ৬/৩৪২) পরিশেষে ঐ যবেহকৃত পশুকেই 'কুরবান' বলা হয়, যা লোকেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পেশ করে থাকে। (তাফসীরে মাযহারী, ২/১৮৮)

ভারতীয় উপমাহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কুরবানী বলতে বোঝায় যিলহজ্জ মাসের ১০ (দশ) থেকে ১২ (বারো) বা ১৩ তের) তারিখ আসর পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উট, গরু, বকরী ও ভেড়া প্রভৃতির মধ্য হতে কোনো এক পশুকে যবেহ করা।

কুরবানীর প্রকারভেদ:

আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা তিন প্রকার হতে পারে:

১. হাদী ২. কুরবানী ৩. আক্বীকাহ

তাই ঈদুল আযহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যবেহ করাকে কুরবানী বলা হয়।

ইসলামী শরীয়তে এটি ইবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কুরআর, হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত দ্বারা প্রমানিত। কুরআন মজীদে যেমন এসেছে

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

‘তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কুরবানী কর।’ [সূরা কাওসার (১০৮):২]।

﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

‘বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরিক নেই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।’ [সূরা আন‘আম: ১৬২-১৬৩]।

আল্লাহর রাসূল (সা.) সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং তিনি (সা.) ছিলেন অধিক সালাত ক্বায়েমকরী ও অধিক কুরবানীদাতা।

হাদীসে এসেছে-

عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين »

বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ঈদের সালাতের পর কুরবানীর পশু যবেহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬১)।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما »

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজ হতে দুটি সাদা-কালো বর্ণের দুম্বা কুরবানী করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলেছেন। তিনি পা দিয়ে দুটো কাঁধের পাশ চেপে রাখেন। (বুখারী-৫৫৬৫, সহীহ মুসলিম-১৯৬৬) তবে বুখারীতে ‘সাদা-কালো’ শব্দের পূর্বে ‘শিংওয়ালা’ কথাটি উল্লেখ আছে।

রাসূল (সা.) কোনো বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। (যাদুল মা‘আদ, ২/৩১৭) ইবনু উমর (রা.) বলেন , ‘নবী (সা.) দশ বছর মদীনায় অবস্থানকলে কুরবানী করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী) যেমন তিনি তার কর্ম দ্বারা কুরবান করতে উম্মতকে অনুপ্রাণীত করেছেন, তেমনি তিনি তার বাক দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন।

(গ) কুরবানীর উদ্দেশ্য :

পশু নিবেদন (বা যবেহ) করা হবে এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে যার কোন শরিক নেই। আল্লাহ রাববুল ‘আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। যেমন তিনি বলেছেন-

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা শুধু আমার ইবাদত করবে' [সূরা আয-যারিয়াত (৫১):৫৬]।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবাদত বলা হয়-

لفظ شامل لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة

-যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ রাববুল 'আলামীন ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন; হোক সে কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে। (ফতহুল মজিদ: ১৭)।

আর এ ইবাদতের ইকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। এ কাজটি তিনি শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন-

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢]

'বল,আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরিক নাই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।' [সূরা-আন'আম (৬):১৬২-১৬৩]।

ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন, ‘এ আয়াতে আল্লাহ রাববুল ‘আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন, যে সকল মুশরিক আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু যবেহ করে তাদের যেন জানিয়ে দেয়া হয় আমরা তাদের বিরোধী। সালাত, কুরবানী শুধু তাঁর নামেই হবে যার কোন শরিক নাই। এ কথাই আল্লাহ তা‘আলা সূরা কাওসারে কলেছেন-

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

‘তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কুরবানী কর।’ [সূরা কাওসার (১০৮):২]।

অর্থাৎ তোমার সালাত ও কুরবানী তাঁরই জন্য আদায় কর। কেননা, মুশরিকরা প্রতিমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে ও পশু যবেহ করে। আর সকল কাজে ইখলাস অবলম্বন করতে হবে। ইখলাসের আদর্শে অবিচল থাকতে হবে।

যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু উৎসর্গ বা যবেহ করবে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা হাদিসে এসেছে-

আবু তোফায়েল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, ‘নবী কারীম (সা:) গোপনে আপনাকে কি বলেছিলে ?’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘আলী (রা.) এ কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন; ‘নবী কারীম (সা.) মানুষের কাছে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি

কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বলল, 'হে আমিরুল মু'মিনীন! সে চারটি কথা কি? তিনি বললেন,

« لعن الله من لعن والديه- ولعن الله من ذبح لغير الله- ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض » (رواه مسلم)

'১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু যবেহ করে আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন। ৩. ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ লা'নত করেন যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে প্রশ্রয় দেয়। ৪. যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। (সহীহ মুসলিম, শরহে নবভী)।

এ কাজগুলো এমন, যে ব্যক্তি তা করল সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে কুফুরির সীমানায় প্রবেশ করল।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নবভী (রাহ.) বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ করার অর্থ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি প্রতিমার নামে যবেহ করল অথবা কোন নবীর নামে যবেহ করল বা কাবার নামে যবেহ করল। এ ধরনের যত যবেহ সব নাজায়েয ও তা খাওয়া হারাম। যবেহকারী মুসলীম হোক বা অমুসলিম।

যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয় তা হারাম ঘোষনা করা হয়েছে,

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ ﴾ [المائدة: ٣]

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তুর রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু, আর শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তুও; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব হলো পাপ-কার্য। [সূরা মায়িদাহ (৫):৩]।

ইবনে কাসীর (রাহ.) বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয় তা যে হারাম এ ব্যাপারে মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ করে সে জাহান্নামে যাবে। যেমন হাদিসে এসেছে- সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। এ কথা শুনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করল এটা কীভাবে হবে? তিনি বললেন, দু'ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি তাদের কাছ দিয়ে যাবে তাকে তাদের প্রতিমার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে হবে। সে সম্প্রদায়ের লোকেরা এ দু'জনের একজনকে বলল, আমাদের এ প্রতিমার জন্য কিছু উৎসর্গ কর! লোকটি উত্তর দিল- আমার কাছে তো এমন কিছু নেই যা আমি

এ প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করতে পারি। তারা বলল একটি মাছি হলেও উৎসর্গ কর। সে একটি মাছি উৎসর্গ করল। তারা তাকে ছেড়ে দিল। ফলে সে জাহান্নামে গেল। তারপর তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অনুরূপ কথা বলল। সে উত্তরে বলল আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কিছু উৎসর্গ (নিবেদন) করি না। তারা তাকে হত্যা করল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল। (আবু নঈম, আহমদ)

(ঘ) কুরবানীর বিধান :

কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। (মুগনী, ১৩/৩৬০; ফতহুল বারী, ১০/৩) তরে, কুরবানীর হুকুম কি? ওয়জিব না সুন্নাত ? এ বিষয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে দু'টো মত রয়েছে।

প্রথমত মত: কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) প্রমুখের মত এটাই। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে তারাও ওয়াজিব বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটা অধিকাংশ উলামাদের মত। এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রাহ.) এর প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু এ মতের প্রবক্তারা আবার বলেছেন, 'সমর্থ্য

থাকা অবস্থায় কুরবানী পরিত্যাগ করা মাকরূহ। যদি কোন জনপদের লোকেরা সমর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিতভবে কুরবানী পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কেননা, কুরবানী হলো ইসলামের একটি শিয়ার বা মহান নিদর্শন।(মহাম্মদ বিন উসাইমীন, আহকামুল উযহিয়্যাহ, পৃ. ২৬)

যারা কুরবানী ওয়াজিব বলেন তাদের দলিল:

1. আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন-

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কুরবানী কর ।' [সূরা কাওসার :২]

আর আল্লাহ রাববুল 'আলামিনের নির্দেশ পালন ওয়াজিব হয়ে থাকে।

2. রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন-

«من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا »

'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে।' (মুসনাদ আহমাদ, ২/৩২১; হাকেম, ২/৩৮৯; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৩; হাদিসটি হাসান)

যারা কুরবানী পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি এ হাদিস একটি সতর্কবাণী। তাই কুরবানী ওয়াজিব।

3. রাসূলে কারীম (সা.) কলেছেন-

يا أيها الناس :إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية»«

'হে মানব সকল! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রতি বছর কুরবানী দেয়া। (মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৫; হাদিসটি হাসান)

যারা কুরবানী সুন্নাত বলেন তাদের দলিল:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

« إذا رأيتم هلال ذي حجة وأرادا أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»

'তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করতে চায়,যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কুরবানী সম্পন্ন করার আগে তার কোন চুল ও নাখ না কাটে।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৭)।

এ হাদিসে রাসূল (সা.) এর 'যে কুরবানী করতে চায়' কথা দ্বারা বুঝা যায় এটা ওয়াজিব নয়।

২. রাসূল (সা.) তার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়।

শাইখ ইবনে উসাইমীন (রাহ.) উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ সকল দলিল প্রমান পরস্পর বিরোধী নয়; বরং একটা অন্যটার সম্পূরক।' তাছাড়া, দু' মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। এ কারণে কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ উলামা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নাত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্হা হচ্ছে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী (সা.)- এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

(ঙ) কুরবানীর ফযীলত:

(ক) কুরবানী দাতা নবী ইব্রাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.)- এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

(খ) পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কুরবানী দাতা আল্লাহ রাববুল ‘আলামিনের নৈকট্য অর্জন করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :-

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٧ ﴾ [الحج: ٣٧]

‘আল্লাহর নিকট পৌছায় না উহার গোশত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদের তাক্বওয়া। এ ভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়নদেরকে।’ [সূরা হজ্জ্ব:৩৭]।

(গ) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অভাবীদের আনন্দ দান। আর এটা অন্য এক ধরনের আনন্দ যা কুরবাণীর গোশতের পরিমাণ টাকা যদি আপনি তাদের সদকা দিতেন তাতে অর্জিত হত না। কুরবানী না করে তার পরিমাণ টাকা সদকা করে দিলে কুরবানী আদায় হবে না।

কুরবানীর ফজীলত সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; বরং এ সম্পর্কে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই যঈফ ও জাল। তারপরও কুরবানীর সময় নিকটবর্তী হলে ব্যাপক আকারে এ হাদীসগুলোর ছড়াছড়ি দেখা যায়। বক্তা, লেখক, প্রবন্ধকার

সমানভাবে ঐ যঈফ ও জাল হাদীসগুলো চর্চা করেন। কেউ সেগুলি জুম‘আর খুৎবায় মধুর সুরে পাঠ করেন, কেউ তা নিজ প্রবন্ধে পরিবেশন করে প্রবন্ধের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আবার কেউ বক্তৃতার মঞ্চে পাঠ করে মঞ্চ গরম করেন। আর কুরবানীর ঈদের খুৎবার সময় তো শতকরা ৯৫ ভাগ খত্বীবই ঐ হাদীসগুলোকে খুৎবার মূল পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এর একমাত্র কারণ হলো চরম উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। ইমাম মুসলিম (রাহ.)- এর ভাষায়, ‘যারা যঈফ ও জাল হাদীস জেনে শুনে (সতর্কীকরণ ছাড়াই) বলে বেড়ান তারা আলেম উপাধি পাবার চেয়ে জাহেল উপাধি পাবার অধিক হক্বদার এবং তারা সাধারণ মুসলিম সমাজকে ধোঁকাদানকারী বলে গণ্য হবে।’ (সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকা দ্র.)।

(চ) কুরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি:

কুরবানী করা আল্লাহর এক ইবাদত। আর কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, কোন আমল নেক, সালেহ বা ভাল হয় না, কিংবা গৃহীত ও কৈট্যদানকারী হয় না; যতক্ষণ না তাতে প্রাথমিকভাবে (যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত) দু‘টি শর্ত পূরণ হয়েছে:

প্রথমত: ‘ইখলাস’, অর্থাৎ তা যেন খাটি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। তা না হলে তা আল্লাহর নিকটে কবূল হবে না। যেমন কাবীলের

নিকট থেকে কুরবানী কবুল করা হয়নি এবং তার কারণ স্বরূপ হাবীল বলেছিলেন,

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ ﴾ [المائدة: ٢٧]

অর্থাৎ ‘আল্লাহ তো মুত্তাক্বী (পরহেযগার ও সংযমী)দের কুরবানীই কবূল করে থাকেন। [সূরা মায়িদা (৫):২৭]।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٧ ﴾ [الحج: ٣٧]

অর্থাৎ, ‘আল্লাহর কাছে ওগুলোর (কুরবানীর পশুর) না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। [সূরা হাজ্জ (২২):৩৭]

দ্বিতীয়ত : তা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। [সূরা কাহফ:১১০]।

সুতরাং যারা কেবল বেশী করে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেয় অথবা লোক সমাজে নাম কুড়াবার উদ্দেশ্যে মোটা-তাজা অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে এবং তা প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে তাদের কুরবানী যে ইবাদত নয়- তা বলাই বাহুল্য।

গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে বলেই লোকে একই মূল্যের একটি পূর্ণ পশু কুরবানী না করে একটি ভাগ দিয়ে থাকে। ফলে, একটি ছাগল দিলে দু‘দিনেই শেষ হয়ে যাবে। লোকেরা ছেলে-মেয়েরা খাবে, আর আমার ছেলে-মেয়েরা তাকিয়ে ও দেখবে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

তবে, বাহ্যিকভাবে কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

(১) এমন পশু দ্বারা কুরবানী দিতে হবে যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ কুরবানীর পশু যেন সেই শ্রেণী বা বয়সের হয় যে শ্রেনী ও বয়স শরীয়ত নির্ধারিত করেছে। সেগুলো হলো উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা।এগুলোকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় ‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ যেমন এরশাদ হয়েছে-

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ﴾ [الحج: ٣٤]

‘আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।’ [সূরা হজ্জ(২২):৩৪]

হাদিসে এসেছে-

عن جابر رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تذبحوا إلا مسنه إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان»

‘তোমরা অবশ্যই নির্দিষ্ট বয়সের পশু কুরবানী করবে। তবে তা তোমাদের জন্য দুষ্কর হলে ছয় মাসের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার।’ [মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৩]।

আর আল্লাহর রাসূল (সা.) উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য লোক জন্তু কুরবানী করেননি ও কুরবানী করতে বলেননি। তাই কুরবানী শুধু এগুলো দিয়েই করতে হবে। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে কুরবানীর জন্য সর্বোত্তম জন্তু হলো শিংওয়ালা সাদা-কালো দুম্বা। কারণ রাসূলে কারীম (সা.) এ ধরনের দুম্বা কুরবানী করেছেন বলে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে। অধিকাংশ উলামাদের মতে, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুরবানীর পশু হলো উট, অতঃপর গরু, তারপর মেষ (ভেড়া), তারপর ছাগল। আবার নর মেষ মাদী মেষ অপেক্ষা উত্তম।

যেহেতু এ প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে। (আযওয়াউল বায়ান, ৫/৬৩৪)।

একটি উট ও গরু-মহিষে সাত ব্যক্তি কুরবানীর জন্য শরীক হতে পারে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৮) অন্য এক বর্ণনামতে, উট কুরবানীতেও দশ ব্যক্তি শরীক হতে পারে। ইমাম শাওকানী বলেন, হজ্জের কুরবানীতে দশ এবং সাধারণ কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হওয়াটাই সঠিক। (নায়লুল আওত্বার, ৮/১২৬) য়েমন হাদিসে এসেছে-

عن جابر رضى الله عنه أنه قال: «نحرنا بالحديبية مع النبى صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. »

'আমরা হুদাবিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়েছি।' (ইবনে মাজা-৩১৩২, হাদিসটি সহীহ)।

কিন্তু মেষ বা ছাগলে ভাগাভাগি বৈধ নয়। তবে সওয়াবে একাধিক ব্যক্তিকে শরীক করা যাবে। সুতরাং একটি পরিবারের তরফ থেকে মাত্র একটি মেষ বা ছাগল যথেষ্ট হবে। তাতে সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন। এ বিধানটি সফরের অবস্থায় প্রযোজ্য।

গুণগত দিক দিয়ে উত্তম হলো কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট, অধিক গোশত সম্পন্ন, নিখুঁত, দেখতে সুন্দর হওয়া।

(২) শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানীর পশুর বয়সের দিকটা খেয়াল রাখা জরুরি। উট পাঁচ বছরের হতে হবে। গরু বা মহিষ দু'বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা হতে হবে এক বছর বয়সের। অবশ্য অসুবিধার ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী মেষ কুরবানী করা যায় । প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'দাতালো ছাড়া যবেহ করো না। তবে তা দুর্বল হলে ছয় মাসের মেষ যবেহ কর।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৩) কিন্তু উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, ছ'মাস বয়সী মেষের কুরবানী সিদ্ধ হবে; তা ছাড়া অন্য পশু পাওয়া যাক অথবা না যাক। অধিকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীসের আদেশকে 'ইস্তিহবাব' (উত্তম) বলে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, ঐ হাদীসের মর্মার্থ এটা নয় যে, অন্য কুরবানীর পশু পাওয়া গেলে তবেই ছ'মাস বয়সের মেশশাবকের কুরবানী বৈধ।যেহেতু এমন অন্যান্য দলীলও রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বয়সী মেষেরও কুরবানী বৈধ; প্রকাশ থাকে যে, যদিও কুরবানীদাতা অন্য দাতালো পশু পেয়ে থাকে। যেমন রাসূল (সা.) বলেন, ছ'মাস বয়সী মেষশাবক উত্তম কুরবানী। (মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৪৫; তিরমিযী) উক্কবা বিন আমের (রা.) বলেন, (একদা) নবী (সা.) কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন। উক্কবার ভাগে পড়ল এক ছ'মাসের মেষ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগে ছ'মাসের মেষ হলো?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'এটা দিয়েই তুমি কুরবানী কর।' (সহীহ বুখারী , হাদীস নং ২১৭৮; সহীহ মুসলিম, ১৯৬৫)।

(৩) কুরবানীর পশু যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن البراء بن عازب رضى الله عليه وسلم قال: « قام فينا رسول الله صلى الله وسلم فقال:أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى »

সাহাবী বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন : চার ধরনের পশু, যা দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না। অন্ধ, যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট, পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত; যার কোন অংগ ভেংগে গেছে। নাসাঈ'র বর্ণনায় 'আহত' শব্দের স্থলে 'পাগল' উল্লেখ আছে। (তিরমিজি-১৫৪৬; নাসাঈ'-৪৩৭১; আবূদাউদ; হাদিসটি সহীহ)।

অতএব এ চারের কোন এক ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হয় না। ইবনে কুদামাহ বলেন, 'এ বিষয়ে কোন মতভেদ আছে কিনা তা আমরা জানি না।' (মুগনী, ১৩/৩৬৯)

ত্রুটিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো:

1. **স্পষ্ট কানা (এক চক্ষু অন্ধ):** যে পশুর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে অথবা বেরিয়ে আছে । দৃষ্টিহীন হলে তো অধিক ত্রুটি

হবে। তবে যে পশুটির চক্ষু সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয়নি, সেটির কুরবানী সিদ্ধ হবে। কারণ, তা স্পষ্ট কানা নয়।

2. **স্পষ্ট রোগের রোগা :** যে পশুর ওপর রোগের চিহ্ন প্রকাশিত। যেটি চরতে অথবা খেতে পারে না; যার দরুন দুর্বলতা ও মাংসবিকৃতি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, চর্মরোগও একটি ত্রুটি, যার কারণে চর্বি ও মাংস খারাপ হয়ে তাকে। তেমটি স্পষ্ট ক্ষত একটি ত্রুটি,যদি তার ফলে পশুর ওপর কোন প্রভাব পড়ে থাকে। তবে, গর্ভধারণ কোন ত্রুটি নয়। তবে গর্ভপাত বা প্রসবের টিকটবর্তী পশু একপ্রকার রোগগ্রস্হতা এবং তা একটি ত্রুটি। যেহেতু গাভীন পশুর গোশত অনেকের নিকট অরুচিকর, সেহেতু জেনেশুনে তা ক্রয় করা উচিত নয়। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট বা ক্রয় করার পর গর্ভের কথা জানা গেলে তা কুরবানীরূপে যথেষ্ট হবে। বাচ্চা মৃত হলে যবেহ না করেই খাওয়া যাবে। কেননা, মায়ের যবেহতে সেও হালাল হয়ে যায়। (আহমাদ, আবু দাউদ , তিরিমযী, ইবনু মাজাহ, ইবনে হিববান, হাকেম, দাবা কুত্বনী, ত্বাবারীনী, সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৩৪৩১)।

3. দুরারোগ্য ভগ্নপদ।

4. দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে যার চর্বি ও মজ্জা নষ্ট অথবা শুষ্ক হয়ে গেছে।

উপরে উল্লেখিত হাদীসে মোট চারটি ক্রটিযুক্ত পশুর কুরবানী সিদ্ধ নয় বলে বর্ণিত হয়েছে এবং বাকী অন্যান্য ক্রটির কথা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের মতে, যদি ঐ ক্রটিসমূহের অনুরূপ বা ততোধিক মন্দ ক্রটি কোন পশুতে পাওয়া যায় তাহলে তাতেও কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যেমন- দুই চক্ষু অন্ধ বা পা কাটা প্রভৃতি। (শরহুন নববী, ১৩/২৮)

খাত্ত্বাবী (রাহ.) বলেন, হাদীসে এ কথার দলীল রয়েছে যে, কুরবানীর পশুতে স্পষ্ট খঞ্জ।' অতএব ঐ ক্রটির সামান্য অংশ অস্পষ্ট হবে এবং তা মার্জনীয় ও অধর্তব্য হবে। (মাআলিমুস সুনান, ৪/১০৬)।

পক্ষান্তরে, এমন কতগুলো ক্রটি আছে যা থাকলে কুরবানী আদায় হয় কিন্তু তা মাকরূহ বলে বিবেচিত হয়। তাই এ জাতীয় ক্রটি থেকেও কুরবানীর পশুকে মুক্ত করা উত্তম।

যে ক্রটিযুক্ত পশুর কুরবানী মাকরূহ হবে তা হলো:

- **কান কাটা বা শিং ভাংগা :**

এ ক্রটিযুক্ত পশুর কুরবানী মাকরূহ। তবে আদায় হয়ে যাবে। কারণ, এতে মাংসের কোন ক্ষতি বা কম হয় না এবং সাধারণত এমন ক্রটি পশুর মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে পশুর জন্ম থেকেই শিং বা কান নেই তার দ্বারা কুরবানী মাকরূহ নয়। যেহেতু ভাঙ্গা বা কাটাতে পশুর রক্তাক্ত ও ক্লিষ্ট হয়; যা এক

প্রকার রোগের মতো। কিন্তু জন্ম থেকে না থাকাটা এ ধরনের কোন রোগ নয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ পশুই উত্তম।

- **লেজ কাটা:**

যে পশুর পূর্ণ অথবা কিছু অংশ লেজ কাটা গেছে তার কুরবানী মাকরূহ। ভেড়ার পুচ্ছে মাংসপিণ্ড কাটা থাকলে তার কুরবানী সিদ্ধ নয়। যেহেতু তা এক স্পষ্ট দাগ এবং সামান্য অংশ। অবশ্য এমন জাতের ভেড়া যার পশ্চাতে মাংসপিণ্ড হয় না তার দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ।

- কান চিরা, দৈর্ঘ্যে চিরা, পশ্চাৎ থেকে চিরা, সম্মুখ থেকে প্রস্থে চিরা, কান ফাটা ইতাদি।
- লিঙ্গ কাটা। অবশ্য অণ্ডকোষ কাটা মাকরূহ নয়। যেহেতু খাসীর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মাংস উৎকৃষ্ট হয়।
- দাঁত ভাঙ্গা ও চামড়ার কোন অংশ অগভীর কাটা বা চিরা ইত্যাদি।

(৪) যে পশুটি কুরবানী কারা হবে তার উপর কুরবানী দাতার পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ কুরবানীদাতা যেন বৈধভাবে ঐ পশুর মালিক হয়। সুতরাং চুরিকৃত, আত্মসাৎ কৃত, বন্ধকী পশু, কর্জ করা পশু বা পথে পাওয়া, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রীত পশু দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না। একই ভাবে অবৈধ মূল্য যেমন

সুদ, ঘুষ, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা প্রভৃতির অর্থ) দ্বারা ক্রীত পশুর কুরবানী জায়েয নয়। যেহেতু কুরবানী এক ইবাদত যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হয়। আর কুরবানীর পশুর মালিক হওয়ার ঐ সকল পদ্ধতি হলো পাপপূর্ণ। আর পাপ করার মাধ্যমে কোন প্রকার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। বরং তাতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫)।

কুরবানীর পশু নির্ধারণে মুসলিম সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত, যাতে পশু সর্বগুণে সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু এটা আল্লাহর নিদর্শন ও তা'যীমযোগ্য দ্বীনি প্রতিক সমূহের অন্যতম যা আত্মসংযম ও তাক্বওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢ ﴾ [الحج: ٣٢]

অর্থাৎ, 'এটিই আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করলে এতে তার হৃদয়ের তাক্বওয়া সঞ্জাত। [সূরা হাজ্জ:৩২]।

এতো সাধারণ দ্বীনী প্রতীকসমূহের কথা। নির্দিষ্টভাবে কুরবানীর পশু যে এক দ্বীনী প্রতীক এবং তার যত্ন করা যে আল্লাহর সম্মান ও তা'যীম করার শামীল, সে কথা অন্য এক আয়াত আমাদেরকে নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ (কুরবানীর)

﴿ وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ ﴾ [الحج: ٣٦]

উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম করেছি। [সূরা হাজ্জ:৩৬]

এখানে কুরবানী পশুর তা'যীম হবে তা উত্তম নির্বাচনের মাধ্যমে। ইবনে আববাস (রা.) প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কুরবানী পশুর সম্মান করার অর্থ হলো, পুষ্ট, মাংস, সুন্দর ও বড় পশু নির্বাচন করা।' (তাফসীরু ইবনু কাসীর, ৩৬/২২৯)

রাসূল (সা.) এর যুগে মুসলিমগণ দামী পশু কুরবানীর জন্য ক্রয় করতেন, মোটা-তাজা এবং উত্তম পশু বাছাই করতেন; যার দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর তা'যীম ঘোষণা করতেন। যা একমাত্র তাদের তাক্বওয়া, আল্লাহর প্রতি ভীতি ও ভালবাসা থেকে উদগত হতো। (ফতহুল বারী, ১০/০৯)

অবশ্য মুসলিমকে এ ক্ষেত্রে খেয়াল করা উচিত যে, মোটা-তাজা পশু কুরবানী করার উদ্দেশ্য কেবল উত্তম মাংস খাওয়া এবং আপোষে প্রতিযোগিতা করা না হয়। বরং উদ্দেশ্য আল্লাহর নিদর্শন ও ধর্মীয় এক প্রতীকের তা'যীম এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

কালো রঙ অপেক্ষা ধূসর রঙের পশু কুরবানী উত্তম। মহানবী (সা.) বলেন, 'কালো রঙের দু'টি কুরবানী অপেক্ষা ধূসর রঙের একটি কুরবানী আল্লাহর নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।' (আহমাদ, হাকিম, সিলসিলাহ সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৬১)

সুতরাং কুরবানীর পশু ক্রয়ের সময় ক্রটিমুক্ত দেখা ও তার বয়সের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। যেহেতু পশু যত নিখুত হবে তত আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে, সওয়াবেও খুব বড় হবে এবং কুরবানীদাতার আন্তরিক তাক্বওয়ার পরিচায়ক হবে।

কারণ আল্লাহ বলেন:

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٧ ﴾ [الحج: ٣٧]

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ওগুলোর (কুরবানীর পশুর) না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। [সূরা হাজ্জ:৩৭]।

(ছ) কুরবানীর নিয়ামাবলি:

কুরবানীর পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা

কুরবানীর জন্য পশু পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য নিম্মোক্ত দু‘টো পদ্ধতির একটি নেয়া যেতে পারে।

(ক) মুখের উচ্চারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এভাবে বলা যায় যে, এ পশুটি আমার কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হলো।' তবে ভবিষ্যৎ বাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না । যেমন বলা হলো- 'আমি এ পশুটি কুরবানীর জন্য রেখে দেব।'

(খ) কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় যেমন কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করল অথবা কুরবানীর নিয়তে যবেহ করল। যখন পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট। করা হলো তখন নিম্মোক্ত বিষয়াবলী কার্যকর হয়ে যাবে।

প্রথমত: এ পশু কুরবানী ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, দান করা যাবে না, বিক্রি করা যাবে না। যেহেতু যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে কুরবানী ভালভাবে আদায় করার জন্য তার চেয়ে উত্তম পশু দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে।

দ্বিতীয়ত: যদি পশুর মালিক ইন্তেকাল করেন তাহলে তার ওয়ারিশদের দায়িত্ব হলো এ কুরবানী বাস্তবায়ন করা। বরং তার ওয়ারিশগণ তা যবেহ করে নিজেরা খাবে, দান করবে ও উপঢৌকন দিবে।

তৃতীয়ত: এ পশুর থেকে কোন ধরনের উপকার ভোগ করা যাবে না। যেমন- দুধ বিক্রি করতে পারবে না, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারবে না, সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, পশম বিক্রি করা যাবে না। যদি পশম আলাদা করে তবে তা সদকা

করে দিতে হবে, বা নিজের কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে, বিক্রি করে নয়।

চতুর্থত: কুরবানী দাতার অবহেলা বা অযত্নের কারণে যদি পশুটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে (এমন ধরনের ত্রুটি যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয়না, যেমন- স্পষ্ট খঞ্জতা ইত্যাদি) বা চুরি হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায় তাহলে তার কর্তব্য হবে অনুরূপ বা তার চেয়ে ভাল একটি পশু ক্রয় করা।

আর যদি অবহেলা বা অযত্নের কারণে দোষযুক্ত না হয়ে অন্য কারণে হয়, তাহলে দোষযুক্ত পশু কুরবানী করলে চলবে।

পঞ্চমত: যদি পশুটি হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায় আর কুরবানী দাতার উপর পূর্ব থেকেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে সে কুরবানীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। আর যদি পূর্ব থেকে ওয়াজিব ছিল না কিন্তু সে কুরবানীর নিয়তে পশু কিনে ফেলেছে তাহলে চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা হারিয়ে গেলে তাকে আবার পশু কিনে কুরবানী করতে হবে।

ষষ্ঠত: কুরবনীর পশুর কোন অংশ (মাংস, চর্বি, চামড়া, দড়ি ইত্যাদি) বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু, তাই কোন প্রকার পুনরায় তা নিজের ব্যবহারে ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। তদনুরূপ ঐ পশুর কোন অংশ দ্বারা কসাইকে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু সেটাও এক প্রকার বিনিময় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৭)

অবশ্য কসাই গরীব হলে দান স্বরূপ অথবা গরীব না হলে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কুরবানীর গোশত ইত্যাদি দেওয়া দূষণীয় নয়। যেহেতু তখন তাকে অন্য হকদারদের শামিল মনে করা হবে: বরং সেই অধিক হকদার হবে। কারণ সে ঐ কুরবানীতে কর্মযোগে শরীক হয়েছে এবং তার মনে ওর প্রতি আশান্বিত হয়েছে। তবে উত্তম হচ্ছে তার মজুরী আগে মিটিয়ে দেবে এবং পরে কিছু দান বা হাদিয়া দেবে, যাতে কোন সন্দেহ ও গোলযোগই অবশিষ্ট না থাকে। (ফতহুল বারী , ৩/৫৫৬)।

সপ্তমত: পশু ক্রয় করার পর যদি তার বাচ্চা হয়, তাহলে মায়ের সাথে তাকেও কুরবানী করতে হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৫০৩) এবং এর পূর্বে ঐ পশুর দুধ খাওয়া যাবে; তবে শর্ত হলো, যেন ঐ বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। (বাইহাক্বী, ৯/২৮৮; আল-মুমতে, ৭/৫১০)।

কুরবানীর ওয়াক্ত বা সময়

কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানী আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। অবশ্য কাজা হিসেবে আদায় করলে অন্য কথা।

যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের

সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করা হয় তাহলে কুরবানী আদায় হবে না। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: « إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومنحر فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئي»

আল-বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবাতে বলেছেন, ‘এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। অত:পর সালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে যবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানীর কিছু আদায় হলো না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৬৫,৫২২৬)।

সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানীর পশু যবেহ না করে সালাতের খুতবা দু‘টি শেষ হওয়ার পর যবেহ করা ভাল। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ রকম করেছেন। হাদিসে এসেছে-

قال جندب بن سفيان البجلي رضى الله عنه : « صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحرثم خطب ثم ذبح»

সাহাবি জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা.) বলেছেন, নবী কারীম (সা.) কুরবানীর দিন সালাত আদায় করলেন অত:পর

খুতবা দিলেন তারপর পশু যবেহ করলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৮৫)।

عن جندب بن سفيان قال:شهدت النبي يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. »

জুনদাব ইবনে সুফিয়ান বলেন, আমি কুরবানীর দিন নবী কারীম (সা.) এর সাথে ছিলাম । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন আবার অন্য স্থানে যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেন যবেহ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬২)

আর কুরবনীর সময় শেষ হবে যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অতএর কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় হলো চার দিন। যিলহজ্জ মাসের দশ, এগারো, বারো ও তেরো তারিখে। এটাই উলামায়ে কেরামের নিকট সর্বোত্তম মত হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে।

কারণ,

প্রথমত: আল্লাহ রাববুল 'আলামীন বলেন-

﴿ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ ﴾ [الحج: ٢٨]

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদের চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান

কারেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।’ [সূরা হজ্জ্ব:২৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন, ইবনে আববাস (রা.) বলেছেন: ‘এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে বুঝায় কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী তিনদিন।’ (ফাতহুল বারী, ২/৫৬১)

অতএব এ দিনগুলো আল্লাহ তা‘আলা কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

«كل أيام التشريق ذبح»

‘আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিন যবেহ করা যায়।’ (আহমদ-৪/৪২, হাদিসটি সহীহ)।

আইয়ামে তাশরীক বলতে কুরবানীর পরবর্তী তিন দিনকে বুঝায়।

তৃতীয়ত: কুরবানীর পরবর্তী তিন দিনে সওম পালন জায়েয নয়। এ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে এ তিন দিনে কুরবানী করা যাবে।

চতুর্থত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আইয়ামে তাশরীক হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর যিকর করার দিন।’

এ দ্বারা বুঝে নিতে পারি যে, যে দিনগুলো আল্লাহ খাওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন সে দিনগুলোতে কুরবানীর পশু যবেহ করা যেতে পারে।

পঞ্চমত: সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরবানীর পরবর্তী তিনদিন কুরবানীর পশু যবেহ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম (রাহ.) বলেন, আলী ইবনে আবি তালেব (রা.) বলেছেন, 'কুরবানীর দিন হলো ঈদুল আযহার দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন।' অধিকাংশ ইমাম ও আলেমদের এটাই মত। যারা বলেন, কুরবানীর দিন হলো মোট তিন দিন-যিলহজ্জ মাসের দশ, এগারো ও বার তারিখ এবং বার তারিখের পর যবেহ করলে কুরবানী হবে না, তাদের কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই ও মুসলিমদের ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়নি। (যাদুল মা'আদ, ২/৩১৯)

মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী

মূলত কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তির তরফ থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে জীবিত অথবা মৃত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন।

অনেকের ধারণা কুরবানী শুধু মৃত ব্যক্তিদের জন্য বা তাদের পক্ষ থেকে করা হবে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে পৃথক কুরবানী করার কোন দলীল নেই। তবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী করা জায়েয ও একটি সওয়াবের কাজ। কুরবানী একটি সাদকা। আর মৃত ব্যক্তির নামে যেমন সদকা করা যায় তেমনি তার নামে কুরবানীও দেয়া যায়। মৃতব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হবে, ইনশাআল্লাহ। উপরন্তু, মৃতব্যক্তি এ ধরনের পূণ্যকর্মের মুখাপেক্ষীও থাকে। যেমন, মৃত ব্যক্তির জন্য সাদকার বিষয়ে হাদীসে এসেছে

عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : « إن أمي اقتتلت نفسها ولم توصى وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم»-

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (রা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞের করল, ‘হে রাসূল! আমার মা হাঠাৎ ইমেন্তকাল করেছেন। কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয় তিনি কোন কথা বলতে পারলে অসিয়ত করে যেতেন। আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাতে কি তার সওয়াব হবে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৪)।

মৃত ব্যক্তির জন্য এ ধরনের সদকা ও কল্যাণমূলক কাজের যেমন যথেষ্ট প্রয়োজন ও তেমনি তার জন্য উপকারী।

যদি কোন কারণে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পূর্ণ একটি কুরবানী করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজেকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করেন। এটা মোটেই ঠিক নয়। ভাল কাজ নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হয় তারপর অন্যান্য জীবিত ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা যেতে পারে । যেমন হাদিসে এসেছে-

আয়েশা (রা.) ও আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কুরবানী দিতে ইচ্ছা করলেন তখন দু'টো দুম্বা ক্রয় করলেন। যা ছিল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, শিংওয়ালা ,সাদা-কালো বর্ণের এবং খাসি। একটি তিনি তার ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানী করলেন; যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তার রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে, অন্যটি তার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য কুরবানী করেছেন। (ইবনে মাজা, হাদিসটি সহীহ)

মৃত ব্যক্তি যদি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাউকে কুরবানী করার অসিয়ত করে যান, অথবা কিছু ওয়াকফ করে তার অর্জিত অর্থ থেকে কুরবানীর অসিয়ত করে যায়, তবে তার অসীর জন্য ঐ মৃতের কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কুরবানী না করে ঐ অর্থ সাদকাহ খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। করণ, তা সুন্নাহর পরিপন্থী এবং অসিয়তের রূপান্তর। অন্যথা, যদি কুরবানীর জন্য অসিয়তকৃত অর্থ সংকুলান না নয়, তাহলে দুই অথবা ততোধিক বছরের অর্থ একত্রিত করে কুরবানী দিতে হবে। অবশ্য নিজের তরফ থেকে বাকী অর্থ পূরণ করে কুরবানী করলে

তা সর্বোত্তম । মোটকথা, অসীর উচিত, সূষ্ঠ ভাবে অসীয়ত কার্যকর করা এবং যাতে মৃত অসীয়তকারীর উপকারও লাভ হয় তারই যথার্থ প্রয়াস করা। উল্‌্লেখ্য যে, রাসূল (সা.) কর্তৃক আলী (রা.) কে কুরবানীর অসিয়ত করার হাদীসটি যঈফ। (যঈফ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ তিরমিজী, হাদীস নং ২৫৫; যঈফ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; মিশকাত, হাদীস নং ১৪৬২ এর টীকা দ্র.)।

একাধিক মৃতব্যক্তিকে একটি মাত্র কুরবানীর সওয়াবে শরীক করাও বৈধ; যদি তাদের মধ্যে কারো ওপর কুরবানী ওয়াজিব না হয়ে থাকে তবে। রাসূল (সা.) নিজের তরফ থেকে, পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে এবং তার উম্মতের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন; যারা আল্লাহর জন্য তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার জন্য রিসালাত বা প্রচারের সাক্ষ্য দিয়েছে। (মুসনাদ আহমদ, ৬/৩৯১-৩৯২) এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সাক্ষ্য প্রদানকারী কিছু উম্মত তার যুগেই মারা গিয়েছিল। অতএব একই কুরবানীতে কেউ নিজ মৃত পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীকেও সওয়াবে শামিল করতে পাবে।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি কুরবানীকে নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় এবং এতে আল্লাহ তা‘আলার সীমাহীন করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। বরং উচিত হচ্ছে, নিজের নামের সাথে জীবিত-মৃত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনকে কুরবানীর নিয়তে শামিল করা। যেমন-

আল্লাহর নবী (সা.) কুরবানী যবেহ করার সময় বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! এ (কুরবানী) মুহাম্মাদের তরফ থেকে এবং মুহাম্মাদের বংশধরের তরফ থেকে।’ সুতরাং তিনি নিজের নাম প্রথমে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বংশধরদেরকেও তার সওয়াবে শরীক করেছেন।

রাসূল (সা.)-এর তরফ থেকে কুরবানী

তিরমিযী ও আবূ দাউদে আলী (রা.) বর্ণিত একটি যঈফ হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, তাকে রাসূল (সা.) ঐ কুরবানী দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে গেছেন। (যঈফ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ তিরমিজী, হাদীস নং ২৫৫; যঈফ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; মিশকাত, হাদীস নং ১৪৬২ এর টীকা দ্র.)

রাসূল (সা.)এর অসিয়ত সংক্রান্ত যঈফ হাদীসটি ব্যতীত এ পৃথিবীর আর কোন হাদীস কিংবা এক লাখেরও বেশী সাহাবীর জীবনী দ্বারা এটা জানা যায় না যে, কোন সাহাবী কিংবা তাবেঈ‘ ও কোন মুসলীম মনীষী নবী (সা.) এর তরফ থেকে কুরবানী দিয়েছেন। উপরোক্ত যঈফ হাদীসের ভিত্তিতে যদি কেউ নবী (সা.) এর তরফ থেকে কুরবানী দিতে চায় তবে সে দিতে পারে। কিন্তু রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তার উম্মতের পক্ষ থেকে ইসালে-সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন।

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী করা

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী কারাকে 'ভাগে কুরবানী দেয়া' বলা হয়। ভেড়া, দুম্বা, ছাগল দ্বারা এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা পশু কুরবানী করতে পারবেন। আর উট, গরু, মহিষ দ্বারা সাত জনের নামে সাতটি কুরবানী করা যাবে। তবে অংশীদারি ভিত্তিতে কুরবানী করার দু'টি পদ্ধতি হতে পারে-

১.সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। যেমন-কয়েক জন মুসলিম মিলে একটি বকরি ক্রয় করল। অত:পর একজনকে ঐ বকরির মালিক বানিয়ে দিল। বকরির মালিক বকরিটি কুরবানী করল। যে ক'জন মিলে বকরি খরিদ করেছিল সকলে সওয়াবের অংশীদার হলো।

২. মালিকানার অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী। দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বকরি কিনে সকলেই মালিকানার অংশীদার হিসেবে কুরবানী করল। এ অবস্থায় কুরবানী শুদ্ধ হবে না। অবশ্য উট, গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েয কি নাজায়েয অর্থাৎ উট বা গরুর এক সপ্তাংশ একটি পরিবারের তরফ থেকে যথেষ্ট হবে কি? - সে ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ৭ জনের অধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া বৈধ নয়। তা ছাড়া পরিবারের তরফ থেকে একটি পূর্ণ 'দম' (জান) যথেষ্ট হবে। আর ৭ ভাগের

১ ভাগ পূর্ণ ‘দম’ নয়। (ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম, ৬/১৪৯)।

অনেকের মতে একটি মেষ বা ছাগের মতই এক সপ্তাংশ উট বা গরু যথেষ্ট হবে। (শুমাইমিরী, মাজালিসু আশরি যিলহাজ্জাহ, পৃ. ২৬; আল-মুমতে’ ইবনে উসাইমীন, ৭/৪৬২-৪৬৩)।

মূলত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উলামাগণ দু‘ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন:

১ম পক্ষ: মুসাফির ও মুক্বীম উভয় অবস্থায় ১টি উট বা গরু বা মহিষে ৭ জন বা ৭টি পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন।

২য় পক্ষ: মুসাফির অবস্থায় উট বা গরু বা মহিষে ৭ জন বা ৭জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু এ পক্ষ মুক্বীম উভয় অবস্থায় ১টি উট বা গরু বা মহিষে ৭টি পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন না। এদের মতানুযায়ী, মুক্বীম অবস্থায় একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশুই কুরবানী করতে হবে।

কুরবানীতে অংশগ্রহণ ও সাত ভাগা প্রসংগে প্রথম পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তব্য :

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় কুরবানীকেও আল্লাহ বিভিন্নভাবে আদায় করার বিধান দান করেছেন। ফলে আমরা উট, গরু, ছাগল ,ভেড়া, দুম্বার যেকোন একটা কুরবানী করতে পারি, আবার সবগুলো একসাথেও করতে পারি। আবার এককভাবে উট, গরু, মহিষ কুরবানী করতে না পারলেও সাত জন অংশগ্রহণ করতে পারি। কিন্তু একটি জন্তুতে সাত জনের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে নানাবিধ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, শুধু সফরের অবস্থায় সাত জন অংশগ্রহণ করতে পারবে, তবে তাদের একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে, বিভিন্ন পরিবারের হলে নয়। এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই-

ইবনু আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম । এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম। (তিরমিযী নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একটি গরু সাতজনের পক্ষ কুরবানী করা যাবে...। (তিরমিযী)

হাদীসে বর্ণিত 'সাতজনে একটি গরুতে শরীক হয়েছিলাম' এ সাতজন শব্দের অর্থ বুঝতেই অনেকে ভূল করেছেন এবং মনে করেছেন একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাতের অধিক হলে সেই পরিবারের জন্য একটি গরু বা উট যথেষ্ট নয়; অথচ একটি গরু বা উট শুধু এক পরিবার নয়, বরং সাতটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট

। আর সেই পরিবারগুলোর সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন। কারণ হাদীসে সাতজন বলতে সাতজন কর্তা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাদের প্রত্যেকে একেকটা পরিবারের মালিক। যেমন-

আপনি এক পরিবারের কর্তা, সুতরাং আপনার উপরই কুরবানীর বিধান বলবৎ হবে ।আপনার সন্তান ও স্ত্রীর উপর এ বিধান বলবৎ হবে না। তবে হ্যাঁ তাদের কারো নামে যদি এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, তারা কুরবানী দেয়ার সমর্থ্য রাখে। তবে কারো কারো মতে তাদের উপর কুরবানীর বিধান বলবৎ হয়ে যাবে। তিরমিযী শরীফে লিখিত আবু আইয়ুব হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যা নিম্নরূপ:

আতা বিন ইয়াসার বলেন, আমি আবু আইয়ুব (রা.) কে প্রশ্ন করলাম যে, নবী (সা.) এর যুগে কুরবানী কিভাবে করা হতো? তখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি একটি ছাগল কুরবনী করত, সেখান থেকে তারা খেত এবং অন্যদের খাওয়াত, আর মানুষ এভাবে আনন্দিত হতো ও গর্ববোধ করত। আর সে প্রথা বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে আসছে।

ইমাম শাওকানী (রাহ.) নায়লুল আওতার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সঠিক কথা হচ্ছে যে, একটি ছাগল একটি পরিবারের থেকে যথেষ্ট হবে যদিও তারা ১০০ জনের পরিবার অথবা ততধিক হয়। নবী (সা.) এর সুন্নাতের এটাই ফায়সালা। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৯২)।

ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, নবী (সা.) এর তরীক্বা হচ্ছে যে, একটি ছাগল এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে যদি তাদের সংখ্যা অনেক হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৯১)।

নবী (সা.) এর যুগে এক ব্যক্তি যেহেতু একটি ছাগলের কুরবানীতে অংশগ্রহণ করত ও সাত ব্যক্তি একটি গরু কিংবা উটে অংশগ্রহণ করত, সুতরাং সাধারণ ভাবেই বুঝা যায় যে, একটি ছাগল এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য যখন যথেষ্ট ছিল, তখন সাত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কেন যথেষ্ট হবে না।

ইবনে আববাস (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামগণ সাতজন করে একটি গরুতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের লোক ছিলেন।

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘গরু সাত জনের পক্ষ হতে এবং উট সাত জনের পক্ষ হতে কুরবানী করা যাবে।’ (মুসলিম, আবূ দাউদ)।

ভারতবর্ষের মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রাহ.) বলেন, ‘অবশ্যই উট এবং গরুর কুরবানীতে বিভিন্ন পরিবারের অংশগ্রহণ প্রমাণিত যেমন ছাগলে একই পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ প্রমাণিত। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৯৩)।

আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী (রাহ.) বলেন, উট এবং গরুর কুরবানীতে সাত ব্যক্তির অংশগ্রহণ সঠিক যদিও তারা বিভিন্ন পরিবারের হয়ে থাকে। (আর-রওযাতুন নাদিয়াহ, পৃ. ১২৮)।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.) বলেন, 'আর কুরবানী প্রসঙ্গে অধিকাংশ ইমামগণের মত হচ্ছে, কুরবানীতেও হাদী তথা হজ্জের পশুর ন্যায় অংশ গ্রহণ বৈধ যদিও অংশগ্রহণকারীগণ একই পরিবারের সদস্য হয়, কিংবা বিভিন্ন পরিবারের হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক। তরে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) শর্তারোপ করেছেন যে, একই পশুতে বিভিন্ন জনের অংশগ্রহণ তখনই বৈধ যখন তারা পরস্পরের নিকটাত্মীয় হবে। (মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/১৭৭)।

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) মন্তব্য করেন যে, ১টি জন্তুতে সাতজনের অংশগ্রহণের উপর বিজ্ঞ সাহাবা কেরামের আমল প্রমাণিত এবং পরবর্তীতে ইমাম সুফইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফেয়ী, আহমাদ ও ইসহাক এর উপর আমল করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃ৮৮)।

তাছাড়া, একটি গরু যে সাতটি ছাগলের সমান তা নবী (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত:

ইবনু আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল যে, আমার উপর একটি হজ্জের পশু

কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে আছে কিন্তু আমি তা ক্রয় করতে পারছি না। তখন নবী (সা.) তাকে নির্দেশ প্রদান করলেন যেন সে সাতটি ছগল ক্রয় করে সেগুলোকে যবেহ করে। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ)।

ইমাম নববী (রাহ.) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, একটি গরু সাতজনের পক্ষ যথেষ্ট হবে, আর প্রতিটা গরু সাতটি ছাগলের স্থলাভিষিক্ত হবে।

লক্ষনীয় যে, আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রাহ.), ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.), নবাব সিদ্দিক হাসান খান (রাহ.) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম কেউই কুরবানীর ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণের সাথে সফরের কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেননি।

সৌদি আরবের ‘সর্বোচ্চ ওলোা পরিষদের স্থায়ী কমিটি’ নামক ফাতাওয়া বোর্ড ফাতাওয়া প্রদান করেছে যে, ‘একটি পরিবারের হোক কিংবা বিভিন্ন পরিবারের হোক এবং তারা আত্মীয়ই হোক কিংবা অনাত্মীয় হোক।’ (ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১১/৪০১)।

আল্লামা ইবনু উসাইমীন বলেন, ‘একটি ছাগল একজনের পক্ষে যথেষ্ট এবং উট এবং গরুর সাত ভাগের এক ভাগ ঐ পরিমাণ যথেষ্ট যে পরিমাণের জন্য একটি ছাগল যথেষ্ট। (আহকামুল উযহিয়্যাহ ওয়ায যাকাত, পৃ. ৭)।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তব্য:

(ক) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটি পশুই যথেষ্ট:

- এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসে মা আয়িশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, .. অত:পর এ দু'আ পড়লেন-

«بسم الله اللّٰهُمَّ تقبل من محمد وأل محمد ومن أمة محمد»

('আল্লাহ নামে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবূল করে নিন।' এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন। (সহীহ মুসলীম, হাদীস নং ১৯৬৭)।

- বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ।' ইমাম আবু দাউদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়। [তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি, মিশকাত, হা/১৪৭৮; এ হাদীসটির সনদ 'শক্তিশালী' (ইবনু হাজার, ফতহুল বারী, ১০/৬); সনদ হাসান, আলবানী, সহীহ নাসাঈ, হ/৩৯৪০; সহীহ আবু দাউদ, হা/২৪২১; সহীহ তিরমিযী, হা/১২২৫; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩৩]।

- সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে বকরী কুরবানী করার রেওয়াজ ছিল। যেমন- সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, ‘একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী দিতেন। অত:পর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এ নিয়ম রাসূলের যুগ হতে চলে আসছে যেমন তুমি দেখছ। (সহীহ তিরমিযী, হা/১২১৬; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৪৬; মির‘আত, ২/৩৬৭, ৫/১১৪) ।

- একই মর্মে ধনাঢ্য সাহাবী আবু সারীহা (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজার একটি হাদীস উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী বলেন,‘সঠিক কথা হচ্ছে, একটি বকরি একটি পরিবারের পক্ষ হতে যথেষ্ট, যদিও সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে। (সহীহ ইবনু মাজাহ, হ/২৫৪৭; নায়লুল আওতার, ৬/১৪৪)।

- মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রাহ.) বলেন, ‘যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীসগুলোকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সওয়াবে অংশীদার হওয়ার ‘তাবীল’ করেন বা খাস হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীসগুলোকে ‘মানসূখ’ বলতে চান, তাদের এ সব দাবী প্রকাশ্য সহীহ হাদীসের

বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র । (মির'আত, ২/৩৫১, ৫/৭৬)।

- রাসূল (সা.) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হতে দু'টি করে খাসি এবং হজ্জের সফরে মিনায় গরু ও উট কুরবানী করেছেন। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহ, মিশকাত, হা/১৪৫৩; বুখারী, ১/২৩১; সহীহ আবূ দাউদ, হা/১৫৩৯)।

(খ) কুরবানীতে শরীক হওয়া:

- আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা.) বলেন, 'আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯; সনদ সহীহ)।

- জাবির (রা.) বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সাথে হজ্জ ও উমরার সফরে সাথী ছিলাম।..... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮) সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়, যাতে গরু ও উটের মতো বড় পশু যবেহ ও কুটাবাছা এবং গোশত

বণ্টন সহজ হয়। জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদীর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে। (মর‘আত, ২/৩৫৫, ৫/৮৪)।

- আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জের সফরে মিনায় নিজ হাতে ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এরও অধিক) দাড়ানো অবস্থায় ‘নহর’ করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু‘টি সুন্দর শিংওয়ালা খাসি কুরবানী করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সফরসঙ্গী স্ত্রী ও পরিবারের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। (বুখারী, ১/২৩১; সহীহ আবু দাউদ, হা/১৫৩৯) অবশ্য মক্কায় (মিনায়) নহরকৃত উটগুলো সাহাবীগণের পক্ষ থেকেও হতে পারে।

আলোচনা:

ইবনু আববাস (রা.) এর হাদীসটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও আবুদাউদে এবং আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীতে যথাক্রমে ‘হজ্জ’ও ‘মানসিক’ অধ্যায়ে এবং সুনানে ‘কুরবানী’ অধ্যায়ে হাদীসগুলো এসেছে। যেমন-(১) তিরমিযী ‘কুরবানীতে শরীক হওয়া’ অধ্যায়ে ইবনু আববাস, জাবির ও আলী (রা.) থেকে মোট তিনটি হাদী এনেছেন। (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে

ইবনু আববাস,জাবির, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) হতে যে পাঁচটি হাদীস (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলোই সফরে কুরবানী সংক্রান্ত। (৩৬) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আববাস ও জাবির (রা.) থেকে পূর্বের দু'টি হাদীস (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন। (৪) আবু দাউদ শুধুমাত্র জাবির (রা.) এর পূর্ববর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীসটি এনেছেন। তিনটি সহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮ নং হাদীরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই।

বিভ্রাটের কারণ:

মিশকাত শরীফে ইবনু আববাস (রা.) এর সফরের হাদীসটি (১৪৬৯ নং) এবং জাবির (রা.) বর্ণিত ব্যাখ্যাশুন্য হাদীসটি (১৪৫৮ নং) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবত জাবির (রা.) বর্ণিত 'মুত্বলাক্ব' বা ব্যাখ্যাশুন্য হাদীসটিকে ভিত্তি করেই মুক্বীম অবস্থায় গরু বা মহিষে সাতভাগা কুরবানীর নিয়ম চালু হয়েছে। অথচ, ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আববাস ও জাবির (রা.) বর্ণিত বিস্তারিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (মিশকাত, হা/১৪৬৯; মুসলিম , হা/১৩১৮; বুখারী, ১/২৩১) আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীসের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিসগণের সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া, মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় রাসূল (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম কখনো ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। ইমাম মালিক (রাহ.) কুরবানীতে শরীক হওয়ার বিষয়টিকে মাকরূহ মনে করতেন। (মুওয়াত্বা মালেক, পৃ. ২৯৯)।

উভয় পক্ষের প্রদানকৃত দলীল সমূহের পর্যালোচনা:

মুক্বীম অবস্থায় সাতটি পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সাতটি ভাগ দিয়ে একটি উট বা গরু বা মহিষ ক্রয় করে করে কুরবানী করার ব্যাপারে উপরে উল্লেখিত উভয় পক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণিত প্রমাণাদিকে বিশ্লেষণমূলক পর্যলোচনা করলে যে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়, তা হচ্ছে, জাবির (রা.) বর্ণিত আবু দাউদদের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীসটির কারণেই মুসাফির ও মুক্বীম অবস্থায় কুরবানীতে ভাগাভাগি নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত: এ হাদীসটিতে কেবল বলা হচ্ছে, ‘গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন’। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীস তা জাবির (রা.) বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত। **দ্বিতীয়ত:** জাবির (রা.) বর্ণিত সফরের হাদীসগুলো ইমাম আবূ দাউদ যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এ ব্যাখ্যাশূন্য হাদীসটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

সর্বোপরি, উভয় পক্ষের মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলীলাদি পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তা হলে:

1. সফর ও মুক্বীম অবস্থায় একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করার ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত।
2. ভাগে কুরবানী জায়েয।
3. সফর ও মুক্বীম অবস্থায় সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাগে একটি পশু কুরবানী করা যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু কথা না বললেই নয়, তা হলো- হাদীসে বলা হয়েছে, ‘‘সাতজনের পক্ষ থেকে’ (মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪৫৮), কিন্তু আমাদের সমাজে কুরবানী করা হচ্ছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায়, সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হলো, সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। মুক্বীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন- রাসূল (সা.) করতেন। মূলত, এক্ষেত্রে সফরের হাদীসগুলোকে আম হিসেবে ধরা যাচ্ছে না। কারণ, এ হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবীগণ (রা.) মুক্বীম অবস্থায় যে ভাগা কুরবানী করতেন, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন হাদীস নেই। রাসূল (সা.) প্রতি বছর দু‘টি করে খাসি কুরবানী করতেন। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১৪৫৩) অথচ, দঃখের বিষয় বর্তমানে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়; বরং মুক্বীম অবস্থায় সাত পরিবারের বর্তমানে কেবল সাত ব্যক্তির

পক্ষ থেকে নয়; বরং মুক্বীম অবস্থায় সাত পরিবারের ৭-এর অধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে।

আজকাল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানীর সাথে একটি গরুর ভাগা নেওয়া হচ্ছে মূলত গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য কিভাবে হাছিল হবে? কুরবানী হলো পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত, যা তিনি পুত্র ইসমাঈলের জীবনের বিনিময়ে করেছিলেন। আর তা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে পাঠানো একটি পশুর জীবন অর্থাৎ দুম্বা। অতএব ইবরাহীম ও মুহাম্মাদী সুন্নাতের অনুসরণে নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হতে আল্লাহর রাহে একটি জীবন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী দেওয়া উচিত, পশুর দেহের কোন খন্ডিত অংশ নয়।

পরিশেষে, মনে রাখতে হবে কুরবানী হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ও আল্লাহ রাববুল 'আলামিনের নৈকট্য লাভের উপায়। তাই তা আদায় করতে হবে সময়, সংখ্যা ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে শরীয়ত অনুমোদিত নিয়মাবলি অনুসরণ বা শুধু সদকা (দান) নয়।। কুরবানীর উদ্দেশ্য শুধু গোশত খাওয়া নয়, শুধু মানুষের উপকার করা নয় বা শুধু সদকা (দান) নয়। কুরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাববুল 'আলামীনের একটি মহান নিদর্শন তার রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা।

(জ) কুরবানী দাতা যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকবেন

সুন্নাহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত কুরবানীদাতার শরীরের কোন লোম বা চুল, নখ ও চর্মাদি না কাটা ওয়াজিব। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে-

عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إذا رأيتم هلال ذى حجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»

উম্মু সালামাহ (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করার ইচ্ছে করে সে যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য একটি বর্ণনায় আছে- ‘সে যেন চুল ও চামড়া থেকে কোন কিছু স্পর্শ না করে। অন্য বর্ণনায় আছে ‘কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৭; নাসাঈ, মিশকাত, হাদীস নং ১৪৫৯)

বলিষ্ঠ মতানুসারে এখানে এ নির্দেশ ওয়াজিবের অর্থে এবং নিষেধ, হারামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তা ব্যাপক আদেশ এবং অনির্দিষ্ট নিষেধ, যার কোন প্রত্যাহারকারীও নেই। (তাফসীর আযওয়াইল বায়ান, ৫/৬৪০; আল-মুমতি, ৭/৫২৯) তবে কেউ যদি জেনে-শুনে ইচছা করেই চুল-নখ কাটে, তবে তার জন্য জরুরী যে, সে যেন আল্লাহর নিকট ইসেত্মগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে। আর তার জন্য কোন কাফফারা নেই। সে স্বাভাবিকভাবেই কুরবানী করবে। আবার প্রয়োজনে যেমন- নখ ফেটে বা ভেঙ্গে

ঝুলতে থাকলে বা মাথায় জখমের উপর চুল থাকলে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হলে) কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই। কারণ, সে মুহরিম যে হজ্জ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেধেছে তার) অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্য অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডিত করাও বৈধ করা হয়েছে।

কুরবানীদাতা চুল ও নখ না কাটার নির্দেশে কি হিকমত রয়েছে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন, কুরবানী দাতা হজ্জ করার জন্য যারা ইহরাম অবস্থায় বয়েছেন তাদের আমলে যেন শরিক হতে পারেন, তাদের সাথে একাত্মতা রাখতে পারেন।

ইবনুল কায়্যিম (রাহ.) বলেছেন, 'কুরবানী দাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কুরবানী করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ আল্লাহ রাববুল 'আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী (ত্যাগ) করায় অভ্যস্ত হতে পারেন এ জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'(ইবনে উসাইমীন, আহকামুল উযহিয়্যাহ, পৃ.৭৭)।

এমন কোন ব্যক্তি যার চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা ছিল না, সে চুল বা নখ কেটে থাকলে এবং তারপর কুরবানী করার ইচছা হলে তারপর থেকেই আর তা কাটবে না।

কুরবানী করার জন্য কেউ যদি কাউকে ভার দেয় বা অসীয়ত করে, তবে সেও নখ-চুল কাটবে না। অবশ্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অসী এ নিষেধের শামিল হবে না। অর্থাৎ তাদের জন্য নখ-চুল কাটা দূষণীয় নয়। অনুরূপভাবে পরিবারের অবিভাবক কুরবানী

করলে এ নিষেধাজ্ঞা কেবল তার পক্ষে হবে; বাকী অন্যান্য স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয়দেরকে শামিল করবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কুরবানী না থাকলে তারা নিজেদের চুল-নখ কাটতে পারে। যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজ বংশধরের তরফ থেকে কুরবানী করতেন অথচ তিনি তাদেরকে নখ-চুল কাটতে নিষেধ করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(ঝ) কুরবানীর পশু যবেহ করার নিয়মাবলি

কুরবানীদাতা নিজের কুরবানীর পশু নিজেই যবেহ করবেন, যদি তিনি ভালোভাবে যবেহ করতে পারেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে যবেহ করেছেন। আর যবেহ করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম । তাই প্রত্যেকের নিজের কুরবানী নিজে যবেহ করার চেষ্টা করা উচিত।

ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেছেন,'সাহাবি আবু মুসা আশআরী (রা.) নিজের মেয়েদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজ হাতে নিজেদের কুরবানীর পশু যবেহ করেন।' (ফাতহুল বারী, ১০/১৯) তার এ নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারেন। তবে কুরবানীর পশু যবেহ করার দায়িত্ব অন্যকে অর্পণ করা জায়েয আছে। কেননা, সহীহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তেষট্টিটি কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করে বাকিগুলো যবেহ করা দায়িত্ব আলী (রা.) কে অর্পণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮)।

যবেহ করার সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়

১. পশুর প্রতি দয়া করা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। আর তা নিমণরূপে সম্ভব:

- এমন ব্যবস্থা নিয়ে যবেহ করা,যাতে পশুর অধিক কষ্ট না হয় এবং সহজেই প্রাণ ত্যাগ করতে পারে।
- যবেহ যেন খুব তীক্ষ্ম ধারালো ছুরি দ্বারা করা হয় এবং তা খুবই শীঘ্রতা ও শক্তির সাথে যবেহ স্থলে (গলায়) পৌঁচানো হয়।

মূলত; পশুর বিনা কষ্টে খুবই শীঘ্রতার সাথে তার প্রাণ বধ করাই উদ্দেশ্য নবী (সা:) হাদীসে এসেছে-

عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته»

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন: আল্লাহ রাববুল ‘আলামীন সকল বিষয়ে সকলের সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন যবেহ করবে তখনও তা সুন্দর ভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যা যবেহ করা হবে তাকে যেন প্রাশান্তি দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৫৫)

বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মাকরূহ)। যেহেতু নবী (সা.) ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলছেন.'যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।'

(মুসনাদে আহমদ, ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩১৭২; সহীহ তারগীব, ১/৫২৯)।

আর যেহেতু পশুর চোখের সামনেই ছুরি ধার দেওয়ায় তাকে চকিত করা হয়; যা বাঞ্ছিত অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার প্রতিকূল। একইভাবে, একটি পশুকে অন্য একটি পশুর সামনে যবেহ করা এবং ছেচরে যবেহ স্থানে টেনে নিয়ে যাওয়াও মাকরূহ।

২. কুরবানীর পশু যদি উট হয় (অথবা এমন কোন পশু হয় যাকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়) তাহলে তাকে বাম পা বাধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে নহর করা হবে। কেননা আল্লাহ রাববুল 'আলামীন বলেছেন-

﴿ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ ﴾ [الحج: ٣٦] 'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।' [সূরা হজ্জ (২২):৩৬]।

ইবনে আববাস (রা.) বলেন, 'এর অর্থ হলো তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সামনের বাম পা বাঁধা থাকবে। (তাফসীর ইবনে কাসির)।

যদি উট ছাড়া অন্যপশু হয় তাহলে তা বামকাতে শয়নাবস্থায় যবেহ করা হবে। যেহেতু তা সহজ এবং ডান কাতে ছুরি নিয়ে বাম হাত দ্বারা মাথায় চাপ দিয়ে ধরতে সুবিধা হবে। সম্ভব হলে পশুকে ডানকাতে শুইয়ে যবেহ করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে পশুকে আরাম দেওয়াই উদ্দেশ্যে।

পশুর গর্দানের এক প্রান্তে পা রেখে যবেহ করা মুস্তাহাব। যাতে পশুকে অনায়াসে কাবু করা যায়। কিন্তু গর্দানের পিছনদিকে পা মুচড়ে ধরা বৈধ নয়। কারণ, তাতে পশু অধিক কষ্ট পায়। যেমন ইতোপূর্বে আনাস (রা.) বর্ণিত বুখারীর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. যবেহকালে পশুকে কিবলামুখী করে শয়ন করাতে হবে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২/১০৪৩; তবে এ হাদীসটির সনদ নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে।) অন্যমুখে শুইয়েও যবেহ করা সিদ্ধ হবে। যেহেতু বিবলামুখ করে শুইয়ে যবেহ করা ওয়াজিব হওয়ার কোন শুদ্ধ প্রমাণ নেই। (আহকামুল উযহিয়্যাহ, পৃ. ৮৮,৯৫)।

৪. যবেহ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে। কারণ, এটা বলা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ রাববুল‘আলামীন বলেন-

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ ﴾ [الانعام: ١١٨]

‘যার উপর আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর।’ [সূরা আন‘আম (৬):১১৮]।

﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٌۗ ﴾ [الانعام: ١٢١]

‘এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা হতে তোমরা আহার কারো না, এটা অবশ্যই পাপ।’ [সূরা আন‘আম(৬): ১২১]।

আর নবী (সা.) বলেছেন, ‘যা খুন বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ করো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫৬; সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৯৬৮)।

যবেহকালীন সময়ে ‘বিসমিল্লাহ‘র সাথে ‘আল্লাহু আকবার’ যুক্ত করা মুস্তাহাব। অবশ্য এর সঙ্গে কবূল করার দু‘আ ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن جابر رضى الله عنه .. «.وأتى بكبش ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:بسم الله و الله أكبراللّٰهُمَّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. «

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, ... একটি দুম্বা আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন,

بسم الله و الله أكبراللّٰهُمَّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».

‘বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে । এবং আমার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।’ (আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে এসেছে-

« ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ويسمى ويكبر. »

রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি শিংওয়ালা ভেড়া যবেহ করলেন, তখন ‘বিসমিল্লাহ’ ও আল্লাহু আকবার’ বললেন। (সুনানে দারামী, হাদীস নং ১৯৮৮; হাদিসটি সহীহ)।

যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর পাঠের পর –

«اللَّهُمَّ هذا منك ولك»

‘হে আল্লাহ এটা তোমার তরফ থেকে তোমারই জন্য’। বলা যেতে পারে। যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করে দু‘আ করা জায়েয আছে। এ ভাবে বলা ‘হে আল্লাহ তুমি অমুকের পক্ষ থেকে কবূল করে নাও।’ যেমন হাদিসে এসেছে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর দুম্বা যবেহ করার সময় বললেন-

«بسم الله اللَّهُمَّ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد»

‘আল্লাহ নামে, হে আল্লাহ! আপনি মোহাম্মদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবূল করে নিন।’ (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৭)।

মূলত কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে বলবে, ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়ালাক

, আল্লাহুম্মা তাক্বাববাল মিন্নী।’ নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলবে, ‘....তাক্বাবাল্লাহ মিন্নী ওয়ামিন আহলি বাইতি।’ অপরের নামে হলে বলবে, ‘...তাক্বাববাল মিন (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নেবে। (আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, পৃ.৩৬)।

এ সময় নবী (সা:) এর উপর দরূদ পাঠ করা বিধেয় নয়, বরং তা বিদ‘আত। (আল-মুমতে, ৭/৪৯২) যে ‘বিসমিল্লাহ’র সাথে ‘আর-রাহমানির রাহীম’ যোগ করাও সুন্নাত নয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে কোন দলীল নেই। যেমন যবেহ করার লম্বা দু‘আ ‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু’ এর হাদীস যঈফ। (যঈফ আবূ দাইদ, হাদীস নং ৫৯৭)।

যবেহের ঠিক পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ পাঠ জরুরী। এর পর যদি লম্বা ব্যবধান পড়ে যায়, তাহলে পুনরায় তা ফিরিয়ে বলতে হবে। তবে ছুরি ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রস্ততি নেওয়ায় যেটুকু ব্যবধান পড়ে তাতে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ে অপর পশু যবেহ বৈধ নয়। বরং অন্য পশুর জন্য পুনরায় ‘বিসমিল্লাহ’ পরা জরুরী। অবশ্য ‘বিসমিল্লাহ’ বলার পর অস্ত্র পরিবর্তন করাতে আর পুনবায় পড়তে হয় না। উল্লেখ্য যে, পশু যবেহর পর পঠনীয় কোন দু‘আ নেই।

৫. যবেহতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরী। আর তা দুই শাহরগ (কণ্ঠরালীর দু‘পাশে দুটি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভর হয়। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, ‘যা রক্ত প্রবাহিত

করে, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা তোমরা খাও। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাত বা নখ না হয়।' (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৫৬৫) সুতরাং রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী; শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুটি মোটা শিরা।

৬. প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোন অঙ্গ কেটে কষ্ট দেওয়া হারাম। যেমন- ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ জান যাওয়ার আগে বৈধ নয়। একইভাবে, দেহ আড়ষ্ট হয়ে এলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করার পর যদি পুনরায় লাফিয়ে ওঠে, তাহলে আরো কিছুক্ষণ প্রাণ ত্যাগ করার কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু পশুকে কষ্ট দেয়া আদৌ বৈধ নয়।

পশু পালিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও ঘাড় মটকানো যাবে না। বরং তার বদলে কিছুক্ষণ ধরে রাখা অথবা (হাঁস-মুরগীকে ঝুড়ি ইত্যাদি দিয়ে) চেপে রাখা যায়।

যবেহ করার সময় পশুর মাথা যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার খেয়াল করা উচিত। তা সত্ত্বেও যদি কেটে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়, তাহলে তা হালাল হওয়ার ব্যাপাবে কোন সন্দেহ নেই।

যবাই ছেড়ে দেওয়ার পর (অসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে) কোনো পশু উঠে পালিয়ে গেলে তাকে ধরে পুনরায় যবাই করা যায়। নইলে কিছু পরেই সে এমনিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর তা হালাল।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহ করার জন্য পবিত্রতা বা যবেহকারীকে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। যেমন-মাথায় টুপী রাখা বা মাথা ঢাকাও বিধিবদ্ধ নয়। অবশ্য বিশ্বাস ও ঈমানের পবিত্রতা জরুরী। সুতরাং কাফির, মুশরিক ও বেনামাযীর হাতে যবেহ শুদ্ধ নয়।

যেমন- যবেহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিঙে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায করা বিদ'আত।

উল্লেখ্য, যবেহকৃত পশুর রক্ত হারাম। অতএব তা কোন ফল লাভের উদ্দেশ পায়ে মাখা, দেওয়ালে ছাপ দেওয়া বা তা নিয়ে ছুড়াছুড়ি করে খেলা করা বৈধ নয়।

(ঞ) কুরবানীর গোশত বন্টননীতি:

আল্লাহ রাববুল 'আলামীন বলেন-

﴿ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الحج: ٢٨]

'অত:পর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাব গ্রস্থকে আহার করাও।' [সূরা হজ্ব,:২৮]।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর গোশত সম্পর্কে বলেছেন-

كلوا وأطعموا وادخروا»»

'তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।' (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭১)।

'আহার করাও' বাক্য দ্বারা অভাবগ্রস্থকে দান করা ও ধনীদের উপহার হিসেবে দেয়াকে বুঝায়। কতটুকু নিজেরা খাবে, কতটুকু দান করবে আর কতটুকু উপহার হিসেবে প্রদান করবে এব পরিমাণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছে, 'কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা খাওয়া, এক ভাগ দরিদ্রদের দান করা ও এক ভাগ উপহার হিসেবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দান করা মুস্তাহাব (উত্তম)।

কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। 'কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না'-বলে যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) এ বিষয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ জায়েয হবে না। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ' সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে

তবে যতদিন ইচ্ছা কুরবানী দাতা কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। তখন ‘সংরক্ষণ নিষেধ রহিত হওয়া’ সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করা হবে।’ (ফাতহুল বারী, ১০/২৮; ইনসাফ, ৪/১০৭)।

কুরবানীর মাংস যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এমনকি ‘এক যিলহজ্জ থেকে আরেক যিলহজ্জ পর্যমত্ম সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। (আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৫৮; সনদ হাসান: তাফসীরে কুরতুবী, হাদীস নং ৪৪১৩)।

কেউ চাইলে সে তার কুরবানীর সম্পূর্ণ গোশতকে বিতরণ করে দিতে পাবে। আর তা করলে উপরোক্ত আয়াতের বিরোধিতা হবে না। কারণ, ঐ আয়াতে খাওয়ার আদেশ হলো মুস্তাহাব বা সুন্নাত। সে যুগের মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশত খেত না বলে মহান আল্লাহ উক্ত আদেশ দিয়ে মুসলিমদেরকে তা খাবার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ খাওয়া ওয়াজিবও বলেছেন। (তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/২৯২, ৩০০; মুগনী, ১৩/৩৮০; মুমতে, ৫২৫) সুতরাং কিছু খাওয়া হলো উত্তম।

কুরবানীর গোশত হতে কাফেরকে তার অভাব, আত্মীয়তা, প্রতিবেশী অথবা তাকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য দেওয়া বৈধ। আর তা ইসলামের এক মহানুভবতা। (মুগনী, ১৩/৩৮১; ফাতহুল বারী, ১০/৪৪২)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আস (রা.) তার ইহুদী প্রতিবেশীকে দিয়ে গোশত বণ্টন শুরু করেছিলেন। (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ,

হাদীস নং ১২৮; সনদ সহীহ) ‘তোমরা মুসলিমদের কুরবানী থেকে মুশরিকদের আহার করিও না’- মর্মে যে হাদীস এসেছে সেটা যঈফ। (বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৯১১৩)।

কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোন কিছু বিক্রি করা জায়েয নয়। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয নয়। হাদিসে এসেছে-

«ولا يعطى جزارتها شيئا»

‘তার প্রস্তুত করণে তার থেকে কিছু দেয়া হবে না’ (বুখারী- **১৭১৬** সহীহ মুসলিম- **১৩১৭**) তবে দান বা উপহার হিসেবে কসাইকে কিছু দিলে তা নাজায়েয হবে না।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ইখলাসের সাথে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরবানী ও সকল ইবাদাত করার তাওফীক দান করুন— আমীন!